ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৪
পর্যালোচনা ও সুপারিশ

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪

পটভূমি

২০২৪ সালের জুলাই মাসের হয়ে যাওয়া গণঅভ্যুত্থানের ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহুল বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯নং আইন) বাতিল করে তার পরিবর্তে নতুন একটি অধ্যাদেশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমরা এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সবাইকে প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, যতোগুলো কারণ এই জুলাই আন্দোলনের পেছনে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছিলো তার মধ্যে বিগত সরকার দ্বারা উক্ত সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ এর বিধানসমূহের ব্যাপক ও যথেচ্ছ অপব্যবহার ছিলো অন্যতম। জনসাধারনের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সহযোগিতা নিয়ে দেশের ভেতর সীমাহীন নজরদারির সংস্কৃতি চালুর মাধ্যমে একটি দমবন্ধ ও ভয়ের পরিবেশের সৃষ্টি করতে উক্ত আইন এবং এর পূর্বসূরি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর বিভিন্ন বিধানের ভূমিকা রেখেছিলো। সে কারণে, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন ২০২৩ সালের উক্ত আইনটি বাতিল করে নতুন একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তা জনসাধারণের আগ্রহের বস্তুতে পরিণত হয়।

সাইবার জগত বা পরিসর একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত ধারণা। বর্তমান দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন হবে, যার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো না কোনো বিষয় এ জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। এ ছাড়া প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ডিজিটাল প্রযুক্তির যেভাবে উন্নতি হচ্ছে, তাতে অতি শীঘ্রই জগতের প্রতিটি মানুষের স্বার্থসমূহ যে এই জগতের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে, তা বলাই বাহুল্য। সাইবার জগত-সম্পর্কিত সকল বিষয় এবং সভ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাধারণ চর্চা বিবেচনায় নিলে এ বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে যে, কেবলমাত্র একটি আইন প্রণয়ন করে সকলের সব ধরণের স্বার্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ব্যাপক ও বিস্তৃত এ জগত-সম্পর্কিত যে-কোনো নীতিমালা বা আইন করার দৃশ্যমান কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই। সাইবার জগতের যে বৈশিষ্ট্য তাতে কোনো একটি আইন সুনির্দিষ্ট কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে করা হলেও এর প্রভাব রাষ্ট্রীয় সীমানা ছেড়ে বাহিরেও পড়ে। এ ছাড়া বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘের অধীনে প্রত্যেকটি দেশকে মানবাধিকার-বিষয়ক বিভিন্ন কমিটির জবাবদিহিতার মুখে পড়তে হয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন জরিপ করে তার ফলাফল বা সূচক প্রকাশ করে যেখানে এই জগত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সব কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি রাষ্ট্রের সুনামের বিষয়টি জড়িয়ে যায় বলে এ ধরনের আইন করার ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারকদেরকে যথেষ্ট সতর্কতা আর প্রজ্ঞার পরিচিয় দিতে হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সাধারণত এ ধরনের আইন করার সময়, সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মূল্যবোধ, সংবিধানের মূল নীতিমালা, এ সম্পর্কিত বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইনসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের চর্চাগুলো বিবেচনায় নিয়ে স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করে যথাযথভাবে একটি একাডেমিক গবেষণা করে। এরপর উক্ত গবেষণার ফলাফল এ জগত-সম্পর্কিত সকল অংশীজন (বিশেষ করে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী শ্রেণী, সুশীল সমাজ, একাডেমিয়া, পেশাজীবী এবং সাধারণ ব্যবহারকারী ইত্যাদি) বা তাঁদের প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপন করে, তাঁদেরকে সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে, তাঁদের মতামত নিয়ে এবং সেগুলো বিবেচনা, মূল্যায়ন ও পুনর্বিবেচনা করে তারপর এ সম্পর্কিত নীতিমালা বা আইনের খসড়াটি প্রস্তুত করে। প্রথম অবস্থায় এই কাজটি করতে গেলে এর জন্য যদিও কিছুটা সময় এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বাড়তি কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়, কিন্তু তারপরও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে

যে, এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করা হলে, উক্ত গবেষণাটি ভবিষ্যতে এ সম্পর্কিত যে-কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে নীতি-নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এড়িয়ে শ্রেয়তর পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এসব প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে গত দুই দুশক এ জগত-সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে বলেই, যখনই এ ধরনের আইন করার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই তা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশের মতো সীমিত সম্পদ কিন্তু জনবহুল একটি দেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে এর কাঙ্ক্ষিত সুবিধাগুলো ভোগ করতে সক্ষম হয়নি, বরং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ এর মতো ঘৃণ্য আইন প্রণয়ন ও এর যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ করে সারা বিশ্বের বিভিন্ন মাধ্যমে দুর্নাম কুড়িয়েছে।

এ ছাড়া, আইন বা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা সরকারের কেবলমাত্র একটি রুটিন দায়িত্ব নয় বরং আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে জনগণের করের অর্থে গঠিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা জন-তহবিল থেকে সরকারকে যেহেতু উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়, সেজন্য আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক যে-কোনো সরকারকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেহেতু বর্তমান সরকার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারকে প্রাধান্য দিচ্ছে এবং স্বাগত জানাচ্ছে তাই আমাদের প্রস্তাব থাকবে যে, সব ক্ষেত্রে বিশেষ করে সাইবার পরিসর-বিষয়ক সকল আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও উন্নত বিশ্বের সাধারণ চর্চা অর্থাৎ গবেষণা-নির্ভর আইন প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশের আইন-ব্যবস্থায় সাইবার জগত সম্পর্কে বর্তমানে বড় দাগে মোট তিনটি আইন এবং এগুলোর অধীনে প্রণীত অধঃস্তন আইন রয়েছে, যেগুলো দিয়ে বাংলাদেশ সরকার বা নীতি নির্ধারকরা এ জগত-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়কে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ আইনগুলো হচ্ছে- (ক) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, (খ) তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এবং (গ) সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩, যা বহুল বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর প্রায় হুবহু কপি।

আমাদের জানা মতে, এই তিনটি আইনের মধ্যে কেবলমাত্র তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনটি প্রণয়ন করার আগে বাংলাদেশ আইন কমিশন এ বিষয়ে একটি গবেষণা ও প্রতিবেদন (১৮-০৯-২০০২, প্রতিবেদন নাম্বার ৪৭) প্রকাশ করেছিল এবং উক্ত গবেষণার ফলাফল হিসেবে উক্ত প্রতিবেদনে ৯৯টি ধারা সম্বলিত এমন আইনের একটি খসড়া প্রস্তাব হিসেবে উপস্থাপন করেছিলো। যদিও উক্ত প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করার সময় এ সম্পর্কিত অংশীজনের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং চূড়ান্তভাবে প্রণীত আইনে উক্ত প্রতিবেদনে সংযুক্ত প্রস্তাবিত খসড়া থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করা হয়নি, কিন্তু তারপরও সাইবার জগত-সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন-বিষয়ক উন্নত দেশের প্রচলিত চর্চার কিছুটা প্রতিফলন উক্ত প্রচেষ্টায় দৃশ্যমান হয়।

আমরা আগেই বলেছি যে, পূর্ববর্তী ঘৃণ্য ও নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ রহিত করে সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার জগতে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উক্ত অপরাধের বিচার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করার উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবশ্যই ধন্যবাদ ও বিশেষ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে, আমরা মনে করি, উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি এবং বিশ্বের সবচাইতে ঘন জনবসতিপূর্ণ ও সীমিত সম্পদের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনগণকে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে সাইবার জগতটির সকল সম্ভাবনা কার্যকরভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে এ জগতটিকে আর কোনোভাবেই অবহেলা করার সুযোগ নেই। অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, বিগত শতাব্দীর ৯০ দশকের মাঝামাঝিতে

ইন্টারনেট প্রযুক্তিকে সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ফলে যে অসাধারণ সুযোগ তৈরি হয়েছে, তার সর্বোচ্চ সুফল বাংলাদেশ আদায় করে নিতে পারেনি। তিন দশক পেরিয়ে গেলেও বাংলাদেশ যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের যথাযথ ব্যবহার করতে পারেনি এর পেছনে সাইবার জগত সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের সম্যক ধারণা থাকা ও পর্যাপ্ত আইনি কাঠামো গড়ে না উঠার ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ কারণে আমরা মনে করি যে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনলাইন বা সাইবার জগতবিষয়ক যে-কোনো আইন করার আগে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে একটি ব্যাপক এবং বিস্তৃত গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

সাইবার জগতকে অরক্ষিত বা কোনো আইনি কাঠামো ব্যতিরেকে ফেলে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ এবং এ বিষয়টি আমরা অনুধাবন করি। সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩- এর মতো কালো আইনকে বাতিল করে এ বিষয়ক অধ্যাদেশ প্রণয়ন এবং এ জন্য বর্তমান সরকার গত কয়েক মাসে কয়েকটি খসড়া প্রকাশ করে সেখানে জনসাধারণকে মতামত দেওয়ার জন্য যে সুযোগ করে দিয়েছে, সে প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানাই, যদিও সংবাদপত্র মারফত আমরা জেনেছি যে, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪ ইতোমধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। আমরা গভীর হতাশা এবং উদ্বেগের সাথে লক্ষ করেছি যে, জনসাধারণের মতামত দেওয়ার জন্য আলোচ্য অধ্যাদেশের সর্বশেষ যে খসড়া প্রচার করা হয়েছিল, তার বাহিরে অনুমোদন পাওয়া অধ্যাদেশে এমন নতুন অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা আইন প্রণয়নের সাধারণ চর্চার পরিপন্থি। ব্যাপারটিকে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ও বোকা বানানোর একটি অপচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এমন প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪ -এর ওপর একটি পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

ক। সাধারণ বিষয়

১. আমরা মনে করি, এই অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা, সাইবার অপরাধ, সাইবার সুরক্ষা এবং মানুষের মত প্রকাশের অধিকার-সম্পর্কীত বিধানগুলো একত্র করে ফেলেছে এবং অধ্যাদেশ প্রণয়নের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেবলমাত্র কারিগরি জ্ঞাণসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিয়ে "জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি" গঠন প্রস্তাব করে ভবিষ্যতে এর প্রকৃত ও যথাযথ প্রয়োগকে প্রশ্নবিদ্ধ ও দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। বিষয়গুলোকে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যাবে যে, উপরিউক্ত এই সব কিছুকে একই আইন দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করে আসলে কোনো কিছুকেই যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই প্রতিটি বিষয় ভিন্ন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চর্চা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর প্রতিটির জন্য ভিন্ন ধরনের উদ্যোগ, প্রচেষ্টা এবং আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন।

উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাইবার জগতের আইন-বিষয়ক ইদানিংকালের উদ্যোগগুলো অনুসরণ করে বলা যায় যে, বর্তমান অধ্যাদেশে যে বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেই বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে আইনি কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করার জন্য কমপক্ষে তিনটি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যথা- (১) কম্পিউটার বা সাইবার অপরাধ বা কম্পিউটার অপব্যবহার আইন (Computer Crimes Act / Cyber Crimes Act / Computer Misuse Act), যেখানে কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের অপরাধ-সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হবে, (২), সাইবার নিরাপত্তা আইন (Cybersecurity Act), যা মূলত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোগুলো তথ্য ব্যবস্থার সুরক্ষার নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে বিধান করে প্রণীত হবে, এবং (৩) অনলাইন সুরক্ষায় আইন (Online Safety Act), যা অনলাইনে বা সাইবার জগতে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে বিধান অন্তর্ভুক্ত করবে। এর মধ্যে প্রথম দুটি বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে

কোনো দ্বিমত বা সমালোচনা হয় না বিধায় আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই আইনগুলো প্রথমে করে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সম্পর্কিত বিষয়গুলো কিছুটা জটিল এবং সংবেদনশীল বলে এ বিষয়ক আইন করার আগে সরকার ও নীতি নির্ধারকদের উচিত তা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে তাদের মতামত নিয়ে তারপর আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এ ছাড়া, সরকার যদি সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে যতদ্রুত সম্ভব ''বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১'' ও ''তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬''-কে হালনাগাদ করার পাশাপাশি জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা-বিষয়ক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি তথ্য, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক তথ্য ও জনগণের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আইনি কাঠামো ঠিক করা না হলে, সাইবার সুরক্ষার বিষয়টি কোনোভাবেই সম্পূর্ণ হবে না। এ কারণে আমরা মনে করি যে, এই অধ্যাদেশটিকে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

২. উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন প্রাপ্ত অধ্যাদেশে এমন অসংখ্য শব্দের অবতারণা করা হয়েছে, যেগুলো সর্বশেষ খসড়ায় ছিলো না এবং যেগুলোর কোনো সংজ্ঞা আলোচ্য অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ- ডিজিটাল ওয়ারেবলস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট, সফটওয়্যার এজেন্ট, এলগোরিদম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভার্চুয়াল এজেন্ট ডেভেলপার, লার্জ ল্যাংগুয়েজ মডেল, ব্লকচেইন, মেশিন ভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল মানি, ইলেকট্রনিক মুদ্রা, তথ্য সিস্টেম, ক্লাউড, ব্লকচেইন কম্পিউটিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস, এপিআই, কোডিং, ক্যাশ, সফটওয়্যার লগ, ট্রেস ইত্যাদি। আমরা মনে করি, ভবিষ্যতের সমস্যা এড়ানোর জন্য এই বিষয়গুলো এই অধ্যাদেশে এতো বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন আছে কী-না, তা বিবেচনা করা দরকার এবং দরকারি বলে তা চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করা হলে, এই অধ্যাদেশে এগুলোর সংজ্ঞা সাধারণ মানুষের বোধগম্য আকারে পরিষ্কারভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। অন্যথায়, আমাদের বিদ্যমান ফৌজদারি বিচার-ব্যবস্থার ফাঁক দিয়ে একজন প্রকৃত অপরাধী এ অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে নিজের দোষ থেকে রেহাই পেয়ে যেতে পারেন, আবার একজন নিরাপদ ব্যক্তি বিনা দোষে আইনি যন্ত্রণা বা সাজা ভোগ করতে পারেন।

৩. এই অধ্যাদেশের অনেক স্থানে আইন প্রণয়নের সাধারণ রীতি অনুসরণ না করে কোথাও কোথাও কিছু বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও তা করা হয়নি। এ কাজটি করে অধ্যাদেশের বিধানসমূহের ভাষা অযাচিতভাবে দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর করে ফেলা হয়েছে। অধ্যাদেশের কিছু বিধানের ভাষ্য এতোই জটিল যে, এগুলোর মর্মার্থ উদ্ধার করতে একজন কারিগরি বিশেষজ্ঞকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হবে। একজন সাধারণ আইনজীবী, বিচারক বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনির সদস্যরাও প্রথম পাঠে কিছু জিনিস বুঝতে ব্যর্থ হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। বিশেষজ্ঞদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন মূলত যাঁদের জন্য করা হয়েছে, দেশের সেই সাধারণ মানুষের কাছে এর বিধানসমূহ নিশ্চিতভাবেই অস্পষ্ট থাকবে। এ কারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার যে অন্যতম মৌলিক নীতি অর্থাৎ "যাদের জন্য আইন করা হয়েছে, সেই আইনটি বা এর বিধান তাদের কাছে বোধগম্য হতে হবে"- তা ব্যাহত হবে এবং ফলশ্রুতিতে এটি বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই অধ্যাদেশটি সার্বজনীন হবে না, ফলে এটি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

৪. প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ থাকার পরেও এই অধ্যাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দৃষ্টিকটুভাবে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- টেকনলজি (প্রযুক্তি), ফোরকাস্ট (পূর্বাভাস), সাইবার স্পেস (সাইবার জগত), ডিজিটাল মানি (ডিজিটাল মুদ্রা), এডিটকৃত (সম্পাদিত), ইত্যাদি।

৫. এই অধ্যাদেশের কতিপয় স্থানে ''সাইবার নিরাপত্তা'' শব্দগুলোর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যদিও কিছুক্ষেত্রে এ শব্দগুলোর এমন ব্যবহার যথার্থ, কিন্তু তারপরও যেহেতু সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩- কে রহিত করে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ''সাইবার নিরাপত্তা'' শব্দগুলোর পরিবর্তে ''সাইবার সুরক্ষা'' শব্দগুলোকে অত্র অধ্যাদেশে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং অধ্যাদেশের ধারা-২ তে ''সাইবার সুরক্ষা'' শব্দগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাই অত্র অধ্যাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত ''সাইবার নিরাপত্তা'' শব্দগুলোর ব্যবহার পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। এ ছাড়া অত্র অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে এই ''সাইবার নিরাপত্তা'' শব্দগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে, এগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এগুলোর সংজ্ঞা অধ্যাদেশের ধারা-২ তে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

৬. উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন প্রাপ্ত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪-এ ''কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'' শব্দগুলোর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যা অধ্যাদেশটির সর্বশেষ খসড়াতে ছিলো না। ইদানিংকালে সারাবিশ্বে এই শব্দগুলোর ব্যাপক ব্যবহারের কারণে বর্তমানে শব্দগুলোকে আর সাধারণভাবে ব্যবহার করার সুযোগ নেই বলে আমরা মনে করছি, আর তাই আমরা মনে করি এই শব্দগুলোর সংজ্ঞা এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

৭. উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন প্রাপ্ত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪-এর ধারা ২(১) (ভ)-তে নাগরিকদের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকারকে "সাইবার সুরক্ষা"-ধারণাটির সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সারা বিশ্বে যখন মাত্র কয়েকটি দেশ এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তখন বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য এমন একটি সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এ বিধানটি কতটা বাস্তবতা বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে এবং কতটা জনসাধারণকে খুশি করে জনপ্রিয় হওয়ার অভিপ্রায়ে নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে মতামত দিতে আমাদের আরও বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে, যেহেতু সরকারের এমন নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অনেক ধরনের প্রস্তুতি দরকার হবে। তবে, আপাতত অধ্যাদেশের ১(২) ধারা মোতাবেক অত্র অধ্যাদেশটি যেহেতু ''অবিলম্বে কার্যকর'' হবে, তাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে ইন্টারনেট প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে বিবেচনায় একজন নাগরিকের অধিকার কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে এবং কীভাবে নিশ্চিত করবে সে সম্পর্কিত বিধান এই অধ্যাদেশে বা এর অধীনে প্রণীত বিধিতে অতি দ্রুত অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ ছাড়া "ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকার"- এর মধ্যে কোন কোন জিনিস অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাও এই অধ্যাদেশে বা এর অধীনে প্রণীত বিধিতে পরিষ্কার করে বলতে হবে। আমরা মনে করি যে, এ বিষয়টি বিবেচনা করার সময় এই অধ্যাদেশের ধারা ৮, ২৫ ও ২৬ এর বিধানসমূহ বিবেচনায় নিয়ে ইন্টারনেট প্রাপ্তির কারিগরি দিক, ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য দরকারি বিভিন্ন ডিভাইসের প্রতুলতা, নাগরিকদের এ সব ডিভাইস ক্রয়ের ক্ষমতা, আইনি সীমার মধ্যে থেকে কোনো ধরনের বাধা বা প্রতিরোধ ব্যতীত সকল ধরনের তথ্যপ্রাপ্তি, সমালোচনা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হবে।

খ। বিশেষ বিষয়

১। অধ্যাদেশের শিরোনাম

এ অধ্যাদেশের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে “সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪”। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এখানে “সাইবার সুরক্ষা” শব্দগুলোর ব্যবহার যথার্থ হবে না।

এ সংক্রান্ত বিশ্বের সকল নামকরা ডেটাবেইজ এবং এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনগুলোর শিরোনাম বিবেচনায় নিলে এই অধ্যাদেশের নাম “সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধ” অথবা “কম্পিউটার অপব্যবহার” অধ্যাদেশ হওয়া যৌক্তিক বলে মনে হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামান্য দুই-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই এ বিষয়ক আইনের শিরোনাম হিসেবে ‘‘কম্পিউটার অপরাধ’’ বা ‘‘সাইবার অপরাধ’’ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরুপ- Council of Europe Convention on **Cybercrime**, 2001 [Budapest Convention], Arab Convention on Combating Information Technology Offences, 2010 [League of Arab States]; Commonwealth Model Law on **Computer and Computer Related Crime**, 2017, ASEAN Declaration to Prevent and Combat **Cybercrime** 2017, Southern African Development Community (SADC) Model Law on **Computer Crime and Cybercrime**, Draft United Nations Convention against **Cybercrime** [Strengthening international cooperation for combating certain crimes committed by means of information and communications technology systems and for the sharing of evidence in electronic form of serious crimes], August 2024.

এ ছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের এ বিষয়ক আইনের কপিগুলো সম্বলিত যে সব স্বীকৃত ডেটাবেইজসমূহ আছে, সেগুলো যাচাই করেও এ ধরনের আইনের বেলায় “সুরক্ষা” শব্দটির উপস্থিতি না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। বরং এ ধরনের আইনের শিরোনামে “সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধ”, অথবা “কম্পিউটার অপব্যবহার” শব্দগুলোর ব্যবহারই সাধারণ ও জনপ্রিয় চর্চা।

“সাইবার সুরক্ষা” একটি ব্যাপক বিষয় যেখানে কোনো দেশের সীমানায় ব্যবহৃত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিষ্টেম, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য, ইত্যাদির সুরক্ষা থেকে শুরু করে আর ও নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিভিন্ন অপরাধ, সেগুলোর বিচার-প্রক্রিয়া, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, প্রশাসনিক, কারিগরি দক্ষতা ও বিচার-ব্যবস্থার নানান সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে, আমরা মনে করি কেবলমাত্র একটি আইন প্রণয়ন করে এ বিষয়ক সামগ্রিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া, ইন্টারনেটের জ্বালানি হিসেবে পরিচিত যে ‘‘ব্যক্তিগত তথ্য’’ তার সুরক্ষা সম্পর্কিত যথাযথা আইনি কাঠামো বাংলাদেশের নাই। জ্বালানির সুরক্ষা নিশ্চিত না করে কীভাবে সামগ্রিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

এ ছাড়া, খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, ২০২২ সালে যুক্তরাজ্য “অনলাইন সুরক্ষা” বিষয়ক আইন প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করার পর থেকে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ‘‘অনলাইন সুরক্ষা’’ শিরোনামে যে আইন প্রণয়ন করছে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তাতে মূলত অনলাইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ঘৃণ্য বা উগ্র বক্তব্য, অপতথ্য প্রচার, শিশুদের যৌন হয়রানি-বিষয়ক বিধান, অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়-দায়িত্ববিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকে। এখানে লক্ষ করলে দেখা

যাবে যে, এ আইনগুলো “সাইবার সুরক্ষা”, “অনলাইন সুরক্ষা”, বা “ইন্টারনেট সুরক্ষা” সম্পর্কিত সামগ্রিক অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়নি, বরং অনলাইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টিই এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে। এ ছাড়া, যে দেশগুলো ইতোমধ্যে এমন আইন প্রণয়ন করেছে, সেসব দেশে “সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধ” অথবা “কম্পিউটার অপব্যবহার” আইন এবং “ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা” বিষয়ক আইনও বলবত রয়েছে। সেগুলোর পাশাপাশি এমন বিশেষ বিধান, সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক বিধান যোগ করে তারপর “অনলাইন সুরক্ষা” বিষয়ক আইনটি করা হয়েছে। তাই, বাংলাদেশের চাইতে তাদের বিষয়টি ভিন্ন।

সহজ ভাষায় বললে, আলোচ্য সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ধারা-৮(২), ২৫ ও ২৬ এ যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যথা- “দেশ বা এর কোনো অংশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা, জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা” ইত্যাদি বিষয়গুলো যেগুলো মূলত জনগণের মতপ্রকাশের অধিকার-সম্পর্কিত, সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ “অনলাইন সুরক্ষা” ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে। যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, এই সবগুলো অপরাধের কিছু কিছু তো আমাদের এই প্রস্তাবিত অধ্যাদেশেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে আমরা এই যুক্তি মেনে নিতে অপারগ কেননা, যে সব দেশে এই আইন করা হয়েছে, সে আইনে এই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এ বিষয়ক আইনটি করা হয়েছে অন্য বিভিন্ন আইনের সহায়ক হিসেবে। বাংলাদেশের আলোচ্য অধ্যাদেশের মতো করে কোনো মতে আলতো করে স্পর্শ করে নয়।

তাই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাধারণ চর্চা এবং এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনগুলোর শিরোনাম বিবেচনায় নিয়ে এই অধ্যাদেশের নাম “সাইবার অপরাধ” বা “কম্পিউটার অপরাধ” অথবা “কম্পিউটার অপব্যবহার” অধ্যাদেশ হওয়াই যৌক্তিক হবে বলে আমরা মনে করি।

২। ধারা ২

(ক) আইন মুসাবিদা বা ড্রাফটিং এর দৃষ্টিকটু ও বিভ্রান্তিকর উপস্থাপন

আমাদের দেশের সাধারণ চর্চা ও রীতি অনুযায়ী আইনের লিখিত রূপ প্রকাশ করে আইনে ব্যবহৃত কোনো শব্দের অর্থ পরিষ্কার করার জন্য সাধারণত এর ধারা ২ এবং অন্যান্য স্থানে ‘‘সংজ্ঞা’’ বা “ব্যাখ্যা” অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ২-তে এমন অনেকগুলো সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলো আগের সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ বা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এ ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এই অধ্যাদেশে নতুন যে পরিবর্তনটা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান তা হচ্ছে, কিছু শব্দ বা ধারণার সংজ্ঞার সাথে সাথে ইচ্ছেমতো কিছু উদাহরণকে একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে, প্রকৃত সংজ্ঞাটি হয়ে গেছে অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন মুসাবিদা বা ড্রাফটিং এর যে রীতি বা স্বাভাবিক চর্চা তার সঙ্গে এই বিষয়টি মানানসই নয়। আমরা মনে করি, ভবিষ্যতে এই অধ্যাদেশের বিভিন্ন বিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অহেতুক জটিলতা তৈরি করবে।

উদাহরণস্বরুপ, ‘‘ডিজিটাল’’ ও ‘‘ডিজিটাল ডিভাইস’’ শব্দগুলোর সংজ্ঞা লক্ষ করা যাক। আগের সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এ এ শব্দগুলো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল নিম্নলিখিতভাবে-

> (ঞ) “ডিজিটাল” অর্থ যুগ্ম-সংখ্যা (০ ও ১/বাইনারি) বা ডিজিটভিত্তিক কার্য-পদ্ধতি, এবং এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ইলেকট্রিক্যাল, ডিজিটাল ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল,

বায়োমেট্রিক, ইলেকট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল, ওয়্যারলেস বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক টেকনোলজিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ট) "ডিজিটাল ডিভাইস" অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যাহা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস ব্যবহার করিয়া যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং কোনো ডিজিটাল বা কম্পিউটার ডিভাইস সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত এবং সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিতি, ডিজিটাল ডিভাইস সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

কিন্তু, আলোচ্য সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪-এ এই শব্দগুলোর সংজ্ঞা দেওয়ার সময় সেখানে সংজ্ঞার সাথে সাথে ইচ্ছা মতো কিছু উদাহরণ যোগ করা হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে (নতুন সংযুক্তি মোটা অক্ষরে এবং নীচে লাইন দিয়ে উল্লেখ করা হলো)-

(ঞ) "ডিজিটাল" অর্থ যুগ্ম-সংখ্যা (০ ও ১/বাইনারি) বা ডিজিটভিত্তিক কার্য-পদ্ধতি এবং এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ইলেকট্রিক্যাল, ডিজিটাল ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল, বায়োমেট্রিক, ইলেকট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল, ওয়্যারলেস বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক টেকনোলজি, **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টেকনোলজি, ব্লকচেইন, ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, মেশিন ভিশনও** ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ট) "ডিজিটাল ডিভাইস" অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যাহা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস ব্যবহার করিয়া যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং কোনো ডিজিটাল বা কম্পিউটার ডিভাইস সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত এবং সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিতি, ডিজিটাল ডিভাইস সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;" **যাহাতে সফটওয়্যার, এপিআই, কোডিং, সফটওয়্যার এপ্লিকেশন, অ্যালগরিদম, ডেটাভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া কাজ করে, বা যাহাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুল কাজ করে, বা যাহাতে ওয়েবসাইট বা পোর্টাল চলে, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন, মেশিন লার্নিং, গেইমিং, কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, মেশিন ভিশন, ব্লক চেইন, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ইত্যাদি আধুনিক কম্পিউটিং বা সফটওয়্যার বা অ্যাপস** কাজ করে;

এখানে কেন এবং কিসের ভিত্তিতে কিছু উদাহরণ যোগ করা হলো এবং কিছু উদাহরণ যেমন- রোবটিক্স, স্মার্ট ডিভাইস, টেলিভিশন, ইত্যাদি বিভিন্ন যন্ত্রকে বাদ দেওয়া হলো তা বোধগম্য নয়। আবার আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ২ (১)(ব)-তে দেওয়া ম্যালওয়ারের সংজ্ঞায় "ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে কি দুটি শব্দ সমার্থক? যদি হয়, তাহলে এই সংজ্ঞাতে "ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস" শব্দগুলো ব্যবহার করা কাঙ্ক্ষিত।

শুধু ধারা ২ নয়, এই অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারাতেও এমন চর্চার উপস্থিতি মাঝেমাঝেই লক্ষণীয় যেখানে আমাদের দেশে প্রচলিত আইন চর্চার সাধারণ রীতিকে পাশ কাটিয়ে ভিন্ন কিন্তু জটিল ও বিভ্রান্তিকর কিছু প্রচলন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

(খ) কম্পিউটার শব্দের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্তকরণ

যদিও উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন পাওয়া অধ্যাদেশের ধারা ২ (২)-এ বলা হয়েছে যে, "এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে" এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর ধারা ২ (১৩) তে ''কম্পিউটার'' শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, তবুও এই অধ্যাদেশে "কম্পিউটার" শব্দটির একটি সহজবোধ্য "সংজ্ঞা" অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমরা মনে করি, যেহেতু অত্র অধ্যাদেশটির প্রক্ষাপটে এই "কম্পিউটার" শব্দটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এ দেওয়া ''কম্পিউটার'' শব্দটির সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক এবং সেখানে যে সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে, তা এমন-

> "কম্পিউটার" অর্থ যে কোনো ইলেকট্রনিক, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা দ্রুতগতির তথ্য-প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যাহা ইলেকট্রনিক, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস ব্যবহার করিয়া যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং কোনো কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত এবং যাহাতে সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিতি (storage), কম্পিউটার সফটওয়ার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকে;"

এখন উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহার করলে, উক্ত সংজ্ঞায় স্বয়ংক্রিয় টাইপ রাইটার, হাতে বহনযোগ্য ক্যালকুলেটর বা ডেটা সংরক্ষণের ক্ষমতা বা সুবিধাবিহীন নানান যন্ত্র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সে কারণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, সিংগাপুরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ বিষয়ক আইনে ''কম্পিউটার''- শব্দটির সংজ্ঞায় বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ''কম্পিউটার''- শব্দটির সংজ্ঞায় স্বয়ংক্রিয় টাইপ রাইটার, হাতে বহনযোগ্য ক্যালকুলেটর বা ডেটা সংরক্ষণের ক্ষমতা বা সুবিধাবিহীন যন্ত্রসমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এ ছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ প্রদত্ত "কম্পিউটার" শব্দটির উপরিউক্ত সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ মনে হয় না, কেননা এখানে যে-কোনো যন্ত্রকে কম্পিউটার হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদান অর্থাৎ "তথ্য সংরক্ষণ করার" এবং "পুনরুদ্ধার" (retrieve) এই বিষয়গুলোর উপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়। এ কথাটি সত্য যে, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ যেমন- যুক্তরাজ্যের কম্পিউটার অপব্যবহার আইন, ১৯৯০- তে "কম্পিউটার" শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি এবং বিষয়টি আদালতের ব্যাখ্যার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে এ জন্য যে, সেখানকার আদালত যেন কোনো মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তার ওপর ভিত্তি করে "কম্পিউটার" শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে। ১৯৯৭ সালে লর্ড হফম্যান দুটি মামলায় "কম্পিউটার" শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, যা যুক্তরাজ্যে এখনও অনুসরণ করা হয়, যেখানে তিনি মামলার রায়ে বলেন যে, "কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যা তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যবহৃত হয়।" কিন্তু আমরা মনে করি বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি এভাবে আদালতের ব্যাখ্যার জন্য রেখে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের দেশের মানুষের প্রযুক্তি-সম্পর্কিত জ্ঞানের অপ্রতুলতা বিবেচনায় নিয়ে এবং এখন যেহেতু

এই বিধানটি পরিবর্তন করার একটি সুযোগ এসেছে, তাই আমরা মনে করি এখন "কম্পিউটার" শব্দটির একটি যথাযথ সংজ্ঞা এই অধ্যাদেশ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এ ছাড়া, এই বিষয়টি যে গুরুত্বপূর্ণ, তা আলোচ্য অধ্যাদেশের চূড়ান্ত কপি দেখলেও বুঝা যাবে, যেখানে কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, ডিজিটাল ওয়ারেবলস, এই শব্দগুলো পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এগুলো সবগুলো সম্ভবত আলাদা জিনিস, যদিও এ যন্ত্রগুলো তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যবহৃত হয়।

গ। "উপাত্ত-ভান্ডার" শব্দটির সংজ্ঞা

উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন পাওয়া এই অধ্যাদেশের চূড়ান্ত কপিতে "উপাত্ত-ভান্ডার" শব্দটি যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটি অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে বিভ্রান্তিকর। এখানে বাংলা এবং ইংরেজি শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সংজ্ঞাটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা কোনো সাধারণ মানুষ বা আইন অঙ্গনের ব্যক্তির পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। লক্ষণীয় যে ব্যাপারটি তা হচ্ছে, এই সংজ্ঞাটিতে "উপাত্ত-ভান্ডার" শব্দটি সম্পর্কিত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ "সংকলন" শব্দটি অনুপস্থিত।

এ ছাড়া, এই একই শব্দের সংজ্ঞায়- তথ্য, ডকুমেন্টস, ফাইল- এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। দেখা যাবে যে, এই সংজ্ঞাটিতে "ডিজিটাল ডকুমেন্টস" এবং "ইলেকট্রনিক ফাইল" এই দুটি ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই দুইটি ধারণার পার্থক্য করা কঠিন, কেননা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এগুলোকে সমার্থক শব্দ আকারে ব্যবহার করে থাকি। উপদেষ্টা পরিষদ যদি এ শব্দগুলোকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত করে তাহলে এই শব্দগুলোর আলাদা সংজ্ঞা এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

পাশাপাশি এই শব্দটির সংজ্ঞাতে "ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত বা বিযুক্ত ডিজিটাল ডকুমেন্টস বা ইলেকট্রনিক ফাইল" এই শব্দগুলো ব্যবহার করে এর প্রয়োগকে সীমিত করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং ভবিষ্যতে যখন নতুন প্রযুক্তি আসবে তখন এই শব্দটি বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি করবে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই সংজ্ঞার মধ্যে কি তাহলে এনক্রিপ্টেড তথ্য অন্তর্ভুক্ত হবে? বা, এ সংজ্ঞার মধ্যে কি ''ফোল্ডার'' ''স্প্রেডশিট'', ''একজিকিউটেবল প্রোগ্রাম'' ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাধারণ রীতি লক্ষ করি, তাহলে দেখা যাবে যে, "**উপাত্ত ভান্ডার**" বলতে এ অধ্যাদেশে যা বোঝানো হয়েছে, সে শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য খুব সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "কম্পিউটার উপাত্ত ভান্ডার" বা "উপাত্ত ভান্ডার" এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, এভাবে-

> "উপাত্ত ভান্ডার" বলতে এমন কোনো রেকর্ডকৃত তথ্যের সংকলনকে বুঝায় যা কম্পিউটারে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিচালনায় সক্ষম এবং যা এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যদিও, "কম্পিউটার সফটওয়্যার" এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তাই আমরা মনে করি পূর্ববর্তী সাইবার নিরাপত্তা আইনে ব্যবহৃত উপাত্ত ভান্ডার শব্দটির মধ্যে ''সংকলন'' শব্দটিকে যুক্ত করে দিয়ে এই শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হলে আলোচ্য অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধন হয়ে যায়। তাই, আমরা নিচের সংজ্ঞাটি প্রস্তাব করছি-

"উপাত্ত ভাণ্ডার" অর্থ টেক্সট, ইমেজ, অডিও বা ভিডিও আকারে উপস্থাপিত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, মৌলিক ধারণা বা নির্দেশাবলির সংকলন, যাহা-

(অ) কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দ্বারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হইতেছে বা হইয়াছে; এবং

(আ) কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে **সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও** ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে;

ঘ। কম্পিউটার সিস্টেম এর সংজ্ঞা স্পষ্টকরণ

সামগ্রিক বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপনের জন্য আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ২(১)(ঙ)-তে অন্তর্ভুক্ত "কম্পিউটার সিষ্টেম"-এর সংজ্ঞাটিতে নিচের প্রস্তাবিত সংজ্ঞাটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে-

"(ঙ) "কম্পিউটার সিস্টেম" অর্থ এক বা একাধিক কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস এর মধ্যে আন্তঃসংযোগকৃত প্রক্রিয়া যাহা এককভাবে বা একে অপরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া **স্বয়ংক্রিয়ভাবে** তথ্য উপাত্ত গ্রহণ, প্রেরণ, **প্রক্রিয়াজাতকরণ** বা সংরক্ষণ করিতে সক্ষম;

ঙ। "গ্লোবাল থ্রেট ইন্টেলিজেন্স" শব্দগুলোর সংজ্ঞা

আলোচ্য অধ্যাদেশের ২(১)(ঝ) ধারাতে "গ্লোবাল থ্রেট ইন্টেলিজেন্স" ধারণাটির সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করার সাথে সাথে এর উদ্দেশ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের সাধারণ চর্চা ও রীতি অনুযায়ী আইনে দেওয়া কোনো শব্দের সংজ্ঞায় এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার বিষয়টি সচরাচর দেখা যায় না বলে তা উক্ত সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

চ। "জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্স রেসপন্স টিম (N-CERT)", "কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম'' বা ''কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম''

এই শব্দগুলোর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দুই ধরনের উপায় অবলম্বন করা হয়েছে।

জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্স রেসপন্স টিম (**N-CERT**) শব্দগুলোর জন্য এর কার্যাবলী নির্দেশ করে একটি বিস্তারিত সংজ্ঞা এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এভাবে-

(ঞ) জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্স রেসপন্স টিম (**N-CERT**) অর্থ একটি সরকার অনুমোদিত সত্তা, যা সাইবার আক্রমণ এবং সাইবার সুরক্ষা-সংক্রান্ত ঘটনাগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ফোরকাস্ট ও পর্যালোচনা করে; সাইবার সুরক্ষা আইন প্রয়োগের কারিগারি জ্ঞান নির্মাণ এবং বিস্তারে সহায়তা করে এবং সাইবার অপরাধের জন্য সব ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে;

অন্যদিকে "**কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম**'' বা ''**কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম**'' শব্দগুলোর জন্য সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে এভাবে যে, "**কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম**'' বা ''**কম্পিউটার**

ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম'' অর্থ ধারা ৯ এর উপধারা (২) এ বর্ণিত "কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম'' বা ''কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম''।

আমরা মনে করি এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাটি ব্যবহার করাই যৌক্তিক এবং যথাযথ, যেখানে প্রয়োজনীয় শব্দগুলোকে অধ্যাদেশের ধারার সাথে যুক্ত করে বলা যেতে পারে এভাবে, "জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম" অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ৯ এ বর্ণিত জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম। এ ছাড়া এ সংজ্ঞা মোতাবেক "**সাইবার অপরাধের জন্য সব ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান**" করার মতো সক্ষমতা উক্ত সত্ত্বার আছে কি-না বিবেচনা করার অবকাশ আছে। এ বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমরা মনে করি এ বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের মাঝে ভবিষ্যতে ভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়ে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হওয়ার সুযোগ হবে, কেননা আমরা জানি যে, বেশ কয়েক বছর আগে এই ব্যবস্থাটি তৈরি হলেও এটি এখনো পূর্ণ কাঠামোর রুপ লাভ করেনি।

ছ। "ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব" শব্দগুলোর সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ

আলোচ্য অধ্যাদেশের ২(১)(ণ) ধারাতে দেওয়া "ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব" শব্দগুলোর এর সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। এই সংজ্ঞাটি পড়ে বুঝা যায় না- এ ধরনের পরীক্ষাগার কী সম্পর্কিত জাতীয় আইন, আন্তর্জাতিক মান এবং কিসের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া, "আন্তর্জাতিকভাবে" শব্দটি শুদ্ধ করতে হবে এবং "ডিজিটাল প্রমাণ" শব্দগুলোর জায়গায় "ডিজিটাল সাক্ষ্য" শব্দগুলো ব্যবহার করা যৌক্তিক হবে।

জ। ''বে-আইনি প্রবেশ'-এর সংজ্ঞায় ''অধিকার'' শব্দের অনুপস্থিতি

আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ২(১) (ন)-তে অন্তর্ভুক্ত "বে-আইনি প্রবেশ"-এর সংজ্ঞাটিতে সামগ্রিক বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য সংজ্ঞাটিতে "বিনা অধিকারে" শব্দগুলোর অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকারী ব্যক্তির সর্বদা অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না এবং এ বিষয়ক আলোচনায় আন্তর্জাতিক আইনসমূহে ''অধিকারের'' বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। সে জন্য আমরা সংজ্ঞাটি নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তাব করছি-

> (ন) "বে-আইনি প্রবেশ" অর্থ **বিনা অধিকারে** বা কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বা উক্তরূপ অনুমতির শর্ত লঙ্ঘনক্রমে কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থায় প্রবেশ, বা উক্তরূপ প্রবেশের মাধ্যমে উক্ত তথ্য ব্যবস্থার কোনো তথ্য-উপাত্তের আদান প্রদানে বাধা প্রদান বা উহার প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত বা ব্যাহত করা বা বন্ধ করা, বা উক্ত তথ্য-উপাত্তের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা সংযোজন বা বিয়োজন করা অথবা কোনো ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ; ক্যাশ থেকে তথ্য-উপাত্ত সরানো, সফটওয়্যার লগ, ট্রেস, রেকর্ড মুছে দেওয়া বা সরানো, ক্ষেত্রবিশেষে স্থানান্তর, ব্লক করা;

ঝ। "ভৌত-অবকাঠামো"-এর সংজ্ঞাটি ভিন্নভাবে উপস্থাপন

আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ২(১) (প)-তে অন্তর্ভুক্ত "ভৌত-অবকাঠামো"- ধারণাটির সংজ্ঞা নিম্নলিখিতভাবে করা হয়েছে-

"(প) **"ভৌত-অবকাঠামো"** অর্থ সকল ধরনের হার্ডওয়্যারভিত্তিক উপাদান ও প্রযুক্তি, যা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এবং ভার্চুয়াল পরিবেশের কার্যক্রমকে সমর্থন করে। ডেটা সেন্টার, সার্ভার এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্কিং অবকাঠামো, ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট, ইন্টারনেট অব থিংস, ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ, ফোরজি-ফাইভজিসহ নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক, স্যাটেলাইট সিস্টেম স্যাটেলাইট, স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ও যোগাযোগ টাওয়ার, যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক, ভূমি-নদী তলদেশের ক্যাবল, সাবমেরিন ক্যাবল, ওভারহেড ফাইবার ক্যাবল, অপটিক্যাল সঞ্চালন নেটওয়ার্ক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

যদিও আমরা মনে করি এই সংজ্ঞাটি খুব সহজ ভাষায় দেওয়া সম্ভব এবং জনসাধারণের সহজে বুঝার জন্য সেটাই করা উচিত, কিন্তু তারপরও সামগ্রিক বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য উপরিউক্ত সংজ্ঞাটির পরিবর্তে আমরা নিচের সংজ্ঞাটি প্রস্তাব করছি -

" "(প) ভৌত-অবকাঠামো" অর্থ ডেটা সেন্টার, সার্ভার এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্কিং অবকাঠামো, ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট, ইন্টারনেট অব থিংস, ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ, ফোরজি ফাইভজিসহ নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক, স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ও ইন্টারনেট, ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ স্থাপনে অবকাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত টাওয়ার, যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক, ভূমি-নদী-সমুদ্র তলদেশে স্থাপিত তার, ওভারহেড ফাইবার ক্যাবল, অপটিক্যাল সঞ্চালন নেটওয়ার্কসহ সকল ধরনের হার্ডওয়্যারভিত্তিক উপাদান ও প্রযুক্তি, যা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এবং ভার্চুয়াল জগতের কার্যক্রমকে যথাযথভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।"

ঞ। "ম্যালওয়্যার" শব্দের প্রদত্ত সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ

অধ্যাদেশের ধারা ২(১)(ব)-তে অন্তর্ভুক্ত "ম্যালওয়্যার"-এর সংজ্ঞাটিতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞাগুলোর উপাদান ''অসদুদ্দেশ্যে তৈরি'', ''ক্ষতিকর'' এবং "ব্যবহারকারীর ইচ্ছা বিরুদ্ধ" এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়নি বলে, আমরা মনে করি প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ। এ ছাড়া, ২(১)(ব)(আ)-তে ব্যবহৃত ''ব্যক্তি'' শব্দটি সম্ভবত সঠিক নয়। সে কারণে, আমরা "ম্যালওয়্যার"- শব্দটির নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রস্তাব করছি-

"(ভ) "ম্যালওয়্যার" অর্থ **অসদুদ্দেশ্যে তৈরিকৃত** এইরূপ কোনো **ক্ষতিকর** ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক নির্দেশ, তথ্য-উপাত্ত, প্রোগ্রাম বা অ্যাপস যাহা **ব্যবহারকারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে**-

(অ) কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস কর্তৃক সম্পাদিত কার্যকে পরিবর্তন, বিকৃত, বিনাশ, ক্ষতি বা ক্ষুণ্ন করে বা উহার কার্য-সম্পাদনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, বা প্রবেশাধিকারের সীমা বা গভীরতা বাড়ায়;

(আ) নিজেকে (স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার টুল বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট বা টুল) অন্য কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের সহিত সংযুক্ত করিয়া উক্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল বা

ইলেকট্রনিক ডিভাইসের কোনো প্রোগ্রাম, তথ্য-উপাত্ত, বা নির্দেশ কার্যকর করিবার বা কোনো কার্য-সম্পাদনের সময় স্বপ্রণোদিতভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে এবং উহার মাধ্যমে উক্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসে কোনো ক্ষতিকর পরিবর্তন বা ঘটনা ঘটায়; বা

(ই) কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের তথ্য চুরি, তথ্য পরিবর্তন ও বিকৃতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপাদিত তথ্য অনুপ্রবেশ বা উহাতে হিউম্যান বা নন হিউম্যান এআই এজেন্টের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে, বা কোডিং বা এলগরিদম পরিবর্তন করে;"

ট। "সাইবার সুরক্ষা" নয় "সাইবার নিরাপত্তা"

আমরা আগেই বলেছি যে, আলোচ্য অধ্যাদেশের শিরোনামে "সাইবার সুরক্ষা" শব্দগুলো ভুল বার্তা প্রদান করে, সে জন্য আলোচ্য অধ্যাদেশটির নাম "সাইবার অপরাধ" বা "কম্পিউটার অপরাধ" বা "কম্পিউটার অপব্যবহার" অধ্যাদেশ হওয়া যৌক্তিক। আগের সরকারের করা আইনের শিরোনামে "সাইবার নিরাপত্তা" শব্দগুলো উপস্থিত ছিলো বলে, এই অধ্যাদেশের বিভিন্ন বিধানে যেখানে দরকার সেখানে এই শব্দগুলো ব্যবহার করা যাবে না, ব্যাপারটি এমন নয়। এই শব্দগুলো আগের সরকারের আবিষ্কার নয় বরং এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। তাই এ শব্দগুলো ব্যবহার না করে নতুনত্ব আনার জন্য "সাইবার সুরক্ষা" শব্দগুলো ব্যবহার করা হলে তা গুণগত কোনো পরিবর্তন আনবে না।

আমরা মনে করি, অধ্যাদেশের ধারা ২(১)(ভ)-তে "সাইবার সুরক্ষা" শব্দগুলোকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা করার প্রয়োজন নেই, কেননা এই সংজ্ঞাতে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুপরিচিত সাইবার নিরাপত্তা (cybersecurity)- ধারণাটির অন্তর্ভুক্ত যেখানে কম্পিউওটার এবং ইন্টারনেট-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের গোপনীয়তা, বিশুদ্ধতা, সুরক্ষা এবং প্রবেশ বা অভিগম্যতা (confidentiality, integrity, and availability) নিশ্চিত করা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ জন্য, এক্ষেত্রে "সাইবার সুরক্ষা" শব্দগুলোর পরিবর্তে "সাইবার নিরাপত্তা" শব্দগুলো ব্যবহার করাই আমাদের কাছে যৌক্তিক বলে মনে হয়।

পাশাপাশি, এই বিষয়টি মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, আইনি কাঠামোর মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে যে বিভিন্ন ধরনের তথ্যকে সুরক্ষা প্রদান করার চেষ্টা করা হয় সেগুলোকে মোটাদাগে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) সরকারি তথ্য (খ) ব্যবসায়িক তথ্য এবং (গ) ব্যক্তিগত তথ্য।

এ ছাড়া, কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকারী ব্যক্তির সর্বদা অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনসমূহে ''অধিকারের'' বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে। স্বীয় অধিকারে কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করা যায় বলে, এই বিষয়গুলো ও সংজ্ঞায় উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যথায় এই অধ্যাদেশের প্রয়োগে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে বলে, "সাইবার সুরক্ষা" শব্দগুলোর পরিবর্তে "সাইবার নিরাপত্তা" শব্দগুলো ব্যবহারের যৌক্তিকতা অনুধাবন করে আমরা নিচের সংজ্ঞাটি প্রস্তাব করছি-

(ভ) **"সাইবার নিরাপত্তা"** বলিতে ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার ডেটা, কম্পিউটার, সিগনালিং ও ট্রাফিক ডেটা, সাইবার **জগত স্বাভাবিকভাবে**

পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা সেন্টার ও ক্লাউডসহ সাইবার জগতের ভৌত-অবকাঠামোর **গোপনীয়তা, বিশুদ্ধতা ও** সুরক্ষার পাশাপাশি **সরকারি, ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত, ইত্যাদি তথ্যের গোপনীয়তা, বিশুদ্ধতা ও** সুরক্ষা এবং সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, **ওয়েবসাইট, উপাত্ত-ভান্ডার** বা নেটওয়ার্কে এবং এগুলোর আনুষঙ্গিক বিষয়ে বৈধ বা অনুমোদিতভাবে প্রবেশের অধিকারী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট বা টুলের **যথাযথ প্রবেশ বা অভিগম্যতা** নিশ্চিত করাকে বুঝাইবে।

এ ছাড়া এই সংজ্ঞায় "নাগরিকদের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকার"- এই ধারণাটির সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা কতটা যৌক্তিক বা বাংলাদেশের মতো একটি দেশের আর্থ-সামাজিক, ভৌগলিক কাঠামো বিবেচনায় তা আদৌ সম্ভব কি-না, তা যে পুনর্বিবেচনার যে গুরুত্ব রয়েছে, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি বলে এই বিষয়টি আমরা এই সংজ্ঞাটির বাহিরে রাখার পক্ষপাতী। এ ছাড়া "সাইবার নিরাপত্তা" বিষয়ক সংজ্ঞায় এভাবে ''অধিকার''- কে জুড়ে দেওয়ার কোনো নজির আন্তর্জাতিক কোনো দলিলে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

ঠ। "সাইবার স্পেস" নয় "সাইবার জগত বা পরিসর"

অধ্যাদেশের ধারা ২(১)(ম)-তে "সাইবার স্পেস" শব্দগুলোর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে-

> "(ম) সাইবার স্পেস" বলিতে আন্তঃসংযোগকৃত সকল ডিজিটাল ডিভাইস এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্কগুলোর সকল ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল জগত বুঝাইবে, যাহার মধ্যে ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন কম্পিউটিং, মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নেটওয়ার্ক, গেইমিং নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, মেশিন ভিশন, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য সকল আধুনিকতম ইলেকট্রনিক ও অপটিকাল যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হইবে; যেখানে ডেটা তৈরি, ডেটা মিররিং, অ্যাক্সেস, প্রেরণ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনাসহ সকল ধরনের হিউম্যান ও নন হিউম্যান অনলাইন কর্মকান্ড সংঘটিত হয় ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার ডেটা, সিগন্যালিং ডেটা, ট্রাফিক ডেটা, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপন্ন ডেটাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

বাংলা শব্দের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং যেহেতু একই ধারা অর্থ্যাৎ ধারা ২(১)(ম)-তে 'ভার্চুয়াল জগত' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তাই সংজ্ঞার জন্য ধারা ২(১)(ম)-তে চিহ্নিত "সাইবার স্পেস" শব্দগুলোর পরিবর্তে "সাইবার জগত" বা "সাইবার পরিসর" শব্দগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া ''অ্যাক্সেস'' শব্দটির পরিবর্তে ''প্রবেশ বা অভিগমন'' শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই শব্দটির সংজ্ঞায় "আন্তঃনির্ভরশীল" এবং "ব্যবহার" শব্দগুলো বাদ পড়ে গেছে বিধায় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করে এই শব্দগুলোর জন্য আমরা নিচের সংজ্ঞাটি প্রস্তাব করছি-

> "(খ) "সাইবার **জগত**" বলিতে আন্তঃসংযোগকৃত **এবং আন্তঃনির্ভরশীল** সকল ডিজিটাল ডিভাইস এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্কগুলোর ভৌতকাঠামো এবং ভার্চুয়াল জগতকে বুঝাইবে, যাহার মধ্যে ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট, উপাত্ত-ভান্ডার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ও অপটিকাল যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত, যেখানে বিভিন্ন ধরনের ডেটা তৈরি, **ব্যবহার, প্রবেশ বা অভিগমন,**

প্রেরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনাসহ সকল ধরনের অনলাইন কর্মকান্ড সংগঠিত হয়। ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার ডেটা, ট্রাফিক ডেটাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

আমাদের প্রস্তাব অনুসরণ করে "সাইবার স্পেস" শব্দগুলোর পরিবর্তে যদি "সাইবার জগত" বা "সাইবার পরিসর" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়, তবে অত্র অধ্যাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত "সাইবার স্পেস" শব্দগুলো "সাইবার জগত" বা "সাইবার পরিসর" শব্দগুলো দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে।

ড। "সেবা প্রদানকারী" ধারণাটির সংজ্ঞা

আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ২(১)(র)-তে অন্তর্ভুক্ত "সেবা প্রদানকারী" ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে-

(র) ''সেবা প্রদানকারী'' অর্থ-

(অ) কোনো ব্যক্তি, সফটওয়্যার নির্মাতা বা এলগরিদম ডেভলপার, বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভার্চুয়াল এজেন্ট ডেভেলপার যিনি কম্পিউটার বা ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যবহারকারীকে যোগাযোগের সামর্থ্য প্রদান করেন; বা

(আ) এইরূপ কোনো ব্যক্তি, সফটওয়্যার নির্মাতা বা এলগরিদম ডেভলপার বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভার্চুয়াল এজেন্ট ডেভেলপার, সত্ত্বা বা সংস্থা যিনি বা যাহা উক্ত সার্ভিসের বা উক্ত সার্ভিসের ব্যবহারকারীর পক্ষে কম্পিউটার ডেটা প্রক্রিয়াকরণ বা সংরক্ষণ করেন।

এই সংজ্ঞাতে কেন "সফটওয়্যার নির্মাতা বা এলগরিদম ডেভলপার, বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভার্চুয়াল এজেন্ট ডেভেলপার" কে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হলো, তা আমাদের বোধগম্য হলো না। এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিলগুলোতে প্রদত্ত সংজ্ঞা বিবেচনায় নিয়ে সংজ্ঞাটিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি-

"(ম) "সেবা প্রদানকারী" অর্থ **এইরূপ** কোনো **সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি, সত্ত্বা বা সংস্থা যিনি বা যাহা**-

(অ) কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে **কোনো ব্যবহারকারীকে যোগাযোগ সেবা** ব্যবহারের সামর্থ্য প্রদান করেন; বা

(আ) উক্ত **যোগাযোগ সেবা বা উহার** ব্যবহারকারীর পক্ষে কম্পিউটার ডেটা প্রক্রিয়াকরণ বা সংরক্ষণ করেন।"

ধারা ৫

আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করে সরকার যদি এই অধ্যাদেশের শিরোনাম পরিবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এর নাম সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধ অধ্যাদেশ করা হয়, তাহলে আলোচ্য খসড়া অধ্যাদেশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "জাতীয় সাইবার সুরক্ষার এজেন্সি" নামে যে এজেন্সি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে, তা গঠনের যৌক্তিকতা পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়টি সত্য এবং পরিষ্কার যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে, কোনো কোনো দেশের এ ধরনের একটি সংস্থা জাতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে

থাকে এবং কোনো কোনো দেশের সংস্থাগুলো অন্য কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকে। তবে সাইবার জগতকে যদি একটি পরিপূর্ণ জগত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তার সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কোন মন্ত্রণালয় যথাযথ হবে, তা বিবেচনা করার জন্য ও একটি বিস্তারিত ও যথাযথ গবেষণা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আমরা আরও মনে করি যে, এ বিষয়ে বর্তমান বাংলাদেশের জনপ্রশাসন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং তারা কী ধরনের সমস্যা বিগত বছরগুলোতে মোকাবেলা করেছেন সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে এ বিষয়টি যথাযথভাবে দেখভাল করার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিষয়ক একটি কাঠামো প্রস্তুত করা দরকার।

ধারা ৬

অধ্যাদেশের ধারা ৬(১)-এ বলা হয়েছে যে, মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ, কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, তথ্যপ্রযুক্তি বা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে, যাহাদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদ বা সার্টিফিকেট রহিয়াছে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণের নিয়োগের বেলায় কম্পিউটার ডিজিটাল তথ্য-প্রযুক্তি বা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে থেকে যাদের এ বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট রয়েছে তাদের মধ্য থেকে নিয়োগ করার বিধানটি বাংলাদেশের আইনের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। তবে এই বিধানটি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগও রয়েছে।

আক্ষরিক অর্থে পড়লে এ বিধানটি থেকে এটি চিন্তা করার সুযোগ আছে যে, সরকারি কর্মকর্তা নয়, এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যারা বিশেষজ্ঞ এবং যাদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট রয়েছে তারা মহাপরিচালক এবং পরিচালক হিসেবে নিয়োগ লাভ করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ এটি সাধারণ কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, এটি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, জনশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করবে। তাই চাইলেই সরকারের অংশ নয় এমন কাউকে এ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ নেই।

এ ছাড়া, বাংলাদেশ সরকারের কর্ম পরিচালনার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এখানে অবশ্যই সরকারি কর্মকর্তাগণকে নিয়োগ দিবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে কতজনের এ বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট বা সনদ আছে, আবার তাদের মধ্যে কতোজনের প্রশাসনিক বিভিন্ন খুঁটিনাটি বুঝার সক্ষমতা আছে, এই বিষয়গুলো বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে।

ধারা ৬(২) নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো-

> (২) মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ এজেন্সির সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন এবং তাহারা এই অধ্যাদেশ এবং তদাধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কার্য-সম্পাদন, চাকরির শর্তাবলি, দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারিত হইবে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ভাষাগত ভাবে, এই ধারা ৬(২) কোনো সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না বিধায়, এটি সংশোধন করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

ধারা ৮

আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ৮ এ জাতীয় সাইবার সুরক্ষায় এজেন্সির মহাপরিচালককে ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য ও উপাত্ত সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো হুমকি সৃষ্টি করলে, তা অপসারণ বা ব্লক করার ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এখানে অতি সাধারণ ও সামান্য একটি বিষয় যুক্ত করে অর্থ্যাৎ উপ-ধারা (৩) এ " . . . এবং অতঃপর তৎবিষয়ে সরকারকে অবহিত করিবে।"-শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ববর্তী সাইবার নিরাপত্তা আইনের বিধানটি হুবহু এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই বিধানটির অপব্যবহার হওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ সরকারের সাধারণ যে কর্মকাঠামো তা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকলে এই কথাটি সহজেই অনুমান করা যায় যে, সরকারের পক্ষ থেকে আগে থেকেই কোনো সংকেত না পেলে, মহাপরিচালক সচরাচর নিজ থেকে কোনো তথ্য ও উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার মতো এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিবেন না। সে কারণে এই ধারায় এই নতুন সংযুক্তি অর্থ্যাৎ " . . . এবং অতঃপর তৎবিষয়ে সরকারকে অবহিত করিবে।" তেমন কোনো গুরুত্ব আসলে বহন করে না।

তবে এখানে যে বিষয়টি আরো উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো তা হচ্ছে, উপ-ধারা (১) এর বিধান বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র মহাপরিচালকের যদি মনে করার কারণ থাকে যে, "ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে, তাহলে তিনি উক্ত তথ্য উপাত্ত অপসারণ বা ক্ষেত্রমতে ব্লক করিবার জন্য টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।" উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন পাওয়া এই অধ্যাদেশের সর্বশেষ খসড়াতে এই বিধানটি ছিলো না। অংশীজনদের সাথে কোনো ধরনের পরামর্শ না করেই চূড়ান্ত অধ্যাদেশে ঝুঁকি মনে করে ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগটি এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন, এই বিধানের ক্ষেত্রে বিশেষ যে উদ্বেগগুলো তৈরি হচ্ছে, তা হলো-

প্রথমত: এই অধ্যাদেশে "সাইবার নিরাপত্তা" ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, ফলে যে কোনো কিছুকেই নিরাপত্তার অজুহাতে ব্লক বা অপসারণ করা যাবে। **দ্বিতীয়ত:** মহাপরিচালকের নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে বলা হয়েছে যে, কম্পিউটার বা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এ পদের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত ও নিযুক্ত হবেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি বিবেচনা করলে জোর দিয়েই বলা যায় যে, এক্ষেত্রে কম্পিউটার বা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন ব্যক্তির মানবাধিকার, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং সংবিধান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যথাযথ দক্ষতা নাও থাকতে পারে। সে কারণে এই বিধানটি অপব্যবহার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমরা এই বিধানটি পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানাই।

যদি এ ধরনের বিধান এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়, তবে তার আগে এই অধ্যাদেশে "সাইবার নিরাপত্তা" ধারণাটির সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। এরপর এমন বিধান যদি অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়, তবে তার জন্য যেন এমন বিধান করা হয় যে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মহাপরিচালক বাংলাদেশের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের, বিশেষ করে মত প্রকাশের স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ও কেবলমাত্র আইনানুগ ক্ষেত্রে আনুপাতিক প্রতিকার হিসেবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে তারপর এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করেন। পাশাপাশি এ জন্য যেন একটি কমিটি গঠন ও একটি বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় এবং এ ধারার অধীনে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোনো বিষয়

যদি মারাত্মক এবং তাৎক্ষণিক ক্ষতির কারণ না হয়, তবে যেন এ ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ না করা হয়- এমন একটি বিধান এখানে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য আমদের প্রস্তাব থাকবে।

একইভাবে ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এ বলা হয়েছে যে, "যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে, বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য ও উপাত্ত দেশের বা উহার কোনো অংশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে, বা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঞ্চার করে, তাহা হইলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী-বাহিনী উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করিবার জন্য, বা ক্ষেত্রমতে স্থানান্তরের জন্য মহাপরিচালকের মাধ্যমে, বিটিআরসি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অনুরোধ করিতে পারিবে।"

বর্তমান বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিষয়টির গুরুত্ব একজন সাধারণ বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এক বাক্যে স্বীকার করবেন। আমরাও এর বিরুদ্ধে নই এবং আইনে এ ধরনের একটি বিধান রাখার যৌক্তিকতা অনুধাবন করি এবং এ ধরনের বিধানের উপস্থিতি বিশ্বের সভ্য দেশসমূহের আইনেও খুঁজে পাওয়া যাবে। এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে, নিরাপত্তা বিষয়ে বাংলাদেশ এমন কোনো বিশেষ ও জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে না, যার উদাহরণ উন্নত অন্য দেশের বেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং যাদের উত্তম চর্চা থেকে আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকে এ ব্যাপারে কাঙ্ক্ষিত বিধান খুঁজে বের করতে পারব না। সে কারণে, আমরা মনে করি, যথাযথভাবে গবেষণা করে, অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে এবং সামগ্রিক বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে তারপরই এ ধরনের বিধান এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা উত্তম। কেননা এ ধরনের বিধানের উপস্থিতি আমরা ঘৃণ্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের ক্ষেত্রে দেখেছি এবং কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে চরমভাবে সেগুলোর অপব্যবহার হতেও আমরা দেখেছি।

এ ছাড়া, বিগত সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার এর রাজনৈতিক চরম অপব্যবহারের কারণে চূড়ান্ত অধ্যাদেশে ". . .তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সংস্থা" শব্দগুলো সংযুক্তি আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করে। এই শব্দগুলো থাকার কারণে সরকার চাইলেই নিজের ইচ্ছামত কোনো একটি সংস্থাকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে ফেলতে পারবে, যা পরবর্তীতে সরকারের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে জনগণের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করার জন্য কাজ করতে পারে। পাশাপাশি এই অধ্যাদেশে যেহেতু নাগরিকের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকারকে সাইবার সুরক্ষা ধারণাটির সংজ্ঞার অন্তর্গত করা হয়েছে, তাই আমরা মনে করি মহাপরিচালকের কোনো তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার যথেচ্ছ ক্ষমতা এই নাগরিকের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সে কারণেও এই বিধানটি গবেষণানির্ভর পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

পরিশেষে, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) এ যদিও বলা হয়েছে যে, "এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে"। এই বিষয়টি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে যেখানে সরকার পরবর্তীতে যুক্তি দিতে পারে যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো অর্থ্যাৎ ''মহাপরিচালক এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষমতা'' নির্ধারিত এবং সরকার শুধু মাত্র "প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি" বিধি দ্বারা নির্ধারিত করিবে। যেহেতু বিধি প্রণয়ন-প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের বা অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই এবং আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, বিধি প্রণয়ন করতে অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত সময় লাগে, সে কারণেই আমাদের উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে এবং সেজন্য আমরা এই বিধানটি পুনর্বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি।

ধারা ৯

এই ধারায় জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং জাতীয় সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার, ইত্যাদি শব্দগুলোর সাথে কখনো ইংরেজি শব্দ সংক্ষেপ যথা- N-CERT, N-SOC যুক্ত করা হয়েছে, কখনো হয়নি। যে-কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

ধারা ৯ (৫)

এই উপধারার (খ) ও (গ) দফাতে "সাইবার বা ডিজিটাল হামলার'' কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অধ্যাদেশে এই শব্দগুলোর কোনো সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। আমরা মনে করি এ বিষয়ে সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

এই উপধারার (ঘ) দফাতে ব্যবহৃত "ফরেনসিক আদান-প্রদান" শব্দগুলো কোনো অর্থ বহন করে না। এ ছাড়া ''টিম'' শব্দের বদলে ''দল'' এবং ''বাই-লেটারাল'' শব্দগুলোর বদলে ''দ্বিপাক্ষিক'' বা ''পারস্পারিক'' শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই উপধারার (ঘ) দফাতে ব্যবহৃত "সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস" শব্দগুলোর পরিবর্তে "নিরাপত্তা বিশ্লেষণ (security analysis)" এবং "সিকিউরিটি সলুউশন" শব্দগুলোর পরিবর্তে "নিরাপত্তা সমাধান (security solution)" শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধারা- ১৬ (৪)

আলোচ্য অধ্যাদেশের ১৬ ধারা-তে যেহেতু ''বিধি'' সম্পর্কিত কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, তাই আমরা মনে করি যে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-পরিকাঠামোর সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা নিরাপত্তা পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই বিষয়ক যথাযথ সনদ থাকার বিধানটি যুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে এই বিধানটি আমরা নিম্নলিখিতভাবে পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব করছি-

"এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিরাপত্তা পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম, **বিধি দ্বারা নির্ধারিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদধারী**, সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে।"

ধারা ১৭ ও ১৮

এই ধারায় "ব্যক্তি" শব্দটি ব্যবহার করার পরে "সফটওয়্যার ডেভেলপার বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার টুলস ব্যবহারকারী" শব্দগুলো ব্যবহার করা আর দরকার পড়ে না বলে আমরা মনে করি। এ ছাড়া বে-আইনি প্রবেশ-সংক্রান্ত বিষয়ে "নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা বেষ্টনি ভেঙ্গে" প্রবেশের বিষয়টি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি-

"১৭। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে **নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা বেষ্টনি ভঙ্গ করে** কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে-

(ক) বে-আইনি প্রবেশ করেন; বা

. . . “

ধারা ১৮র ক্ষেত্রেও “নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা বেষ্টনি ভেঙ্গে” প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

ধারা ১৯: কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম ও সাইবার স্পেসের ভৌত-অবকাঠামো ইত্যাদির ক্ষতিসাধন ও দন্ড

ধারা ১৯(১)(ক)

কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম ও সাইবার জগতের ভৌত-অবকাঠামো ইত্যাদির ক্ষতি সাধন এবং দন্ডবিষয়ক বিধানে **অধিকার, ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নিরাপত্তা-ব্যবস্থা বা বেষ্টনি ভঙ্গ করা**- এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার হলে আমরা মনে করি, অন্যথায় বর্তমানে যেভাবে ধারাটি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে মনে হয় সাধারণভাবে কম্পিউটারে ব্যবহার করে কোনো ধরনের কাজ করা সহজ হবে না।

ধারা ১৯(১)(ঙ) এবং ধারা ১৯(১)(চ)

ধারা ১৯(১)(ঙ) এবং ধারা ১৯(১)(চ) এ অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ সম্পর্কিত বিধানগুলো সাধারণত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ও সাইবার জগতের ভৌত-অবকাঠামো ইত্যাদির ক্ষতি করে না। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ধারা ১৯(১)(ঙ) এ বর্ণিত অযাচিত ইলেকট্রনিক্স মেইল প্রেরণ করা হলে, তা একজন ব্যবহারকারীর জন্য অনেক সময় বিরক্তির উদ্রেগ করতে পারে এবং ধারা ১৯(১)(চ) এর বর্ণনা অনুসারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ বা কারসাজি করে কোনো ব্যক্তির পণ্য বা সেবাগ্রহণ বা ধার্যকৃত চার্জ অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে অন্যের হিসাবে জমা করা হলে তাতে একজন ব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, কিন্তু এ ব্যাপারগুলো কীভাবে কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা সাইবার জগতের ভৌত-অবকাঠামোর ক্ষতি সাধন করে, তা বোধগম্য হয় না বলে, আমরা এই বিধানগুলোকে এই ধারার বিধানের বাহিরে বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব রাখছি।

এ ছাড়া আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত ইলেকট্রনিক মেইলের বিষয়টিকে আলাদা বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে বিবেচনা করা হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও বিবেচনা করার দাবি থাকবে আমাদের। দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারা নিজেদের সেবা বা পণ্যের বিজ্ঞাপনসহ অহরহ-ই এ ধরনের ইমেইল করে থাকেন, কেননা তাদের পক্ষে নিজেদের সামান্য পুজি নিয়ে নিয়ম মেনে বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব হয় না। এ জন্য এ ধরনের কাজের শাস্তির বিষয়টিও পুনর্বিবেচনা করার জন্য আমাদের প্রস্তাব থাকবে। আমরা মনে করি, কোনোভাবেই এ ধরনের কাজের জন্য এতো ব্যাপক আকারে কারাদন্ড বা আর্থিক জরিমানার বিধান করা সমীচীন হবে না।

ধারা ১৯(১)(চ) তে বর্ণিত বিধানটিতে কতিপয় শব্দ যুক্ত করে নিম্নলিখিতভাবে পুনর্বিবেচনা করার জন্য আমরা প্রস্তাব করছি-

> “(চ) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা সাইবার জগতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ বা কারসাজি করিয়া কোনো ব্যক্তির **পণ্য বা** সেবাগ্রহণ বা ধার্যকৃত

চার্জ **অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে** অন্যের হিসাবে জমা করেন বা পরিবার চেষ্টা করেন, তা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।"

ধারা ২০

কম্পিউটার অপরাধ-বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনের বিধানগুলো অনুসরণ করে **ধারা ২০**-এ সাইবার জগতে জুয়া খেলার অপরাধ এবং দণ্ডবিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিকে আমরা সাধুবাদ জানাই। তবে আমরা মনে করি এই ধারার বিধানটি বলবৎ করতে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হবে, কেননা এই ধারায় "জুয়া"- শব্দটির কোনো সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সে কারণে, আমরা মনে করি যে, এই ধারাতে "জুয়া" শব্দটির সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার এবং উক্ত সংজ্ঞাটি এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করার দরকার যাতে করে "জুয়া", "বাজি", "পণ" এবং "লটারি" ইত্যাদির মাঝে সহজে পার্থক্য করা যায়।

ধারা ২১

এই ধারাতে "সাইবার স্পেসে জালিয়াতি" শব্দগুলোর যে সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা যথাযথ অর্থ বহন করে বলে প্রতীয়মান হয় না, কেননা জালিয়াতির অপরাধের মধ্যে- (ক) সাধারণ জনগণ বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গের আর্থিক, ইত্যাদি ক্ষতি করার ইচ্ছা এবং (খ) যিনি জালিয়াতি করছেন তার ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে, আমরা মনে করি যে, উক্ত সংজ্ঞাটি নিম্নলিখিতভাবে পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে-

> "**ব্যাখ্যা-** এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "সাইবার জগতে জালিয়াতি" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট কর্তৃক বিনা অধিকারে বা প্রদত্ত অধিকারের অতিরিক্ত হিসেবে বা অনধিকার চর্চার মাধ্যমে **অসাধু উপায়ে** সাইবার জগত ব্যবহার করিয়া কোনো **ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আর্থিক বা অন্য কোনো ক্ষতি করিয়া নিজের আর্থিক বা অন্য কোনো লাভের উদ্দেশ্যে** কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের ইনপুট বা আউটপুট প্রস্তুত, পরিবর্তন, মুছিয়া ফেলা ও লুকাইবার মাধ্যমে অশুদ্ধ ডেটা বা প্রোগ্রাম, তথ্য বা ভ্রান্তকার্য, তথ্য সিস্টেম, কম্পিউটার বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক পরিচালনা বা ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত বা বিযুক্ত ডিজিটাল ডকুমেন্টস উৎপাদন বা ইলেকট্রনিক ফাইল উৎপাদন বা বিদ্যমান ফাইল পরিবর্তন বা ডিজিটাল মানি বা ইলেকট্রনিক মুদ্রা বা ক্রিপ্টোকারেন্সি উৎপাদন বা অন্যের এনআইডিতে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করিয়া মোবাইল ব্যাংকিং পরিচালনা, হুন্ডিকার্ডে নিযুক্তি কিংবা জুয়ার পোর্টাল পরিচালনা করেন।"

ধারা ২৩

আলোচ্য খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ২৩-এ সাইবার সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধ ও দণ্ডসম্পর্কিত যে বিধান করা হয়েছে তার পরিধি ২০০৯ সালে প্রণীত সন্ত্রাস বিরোধী আইন (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর পরিধির তুলনায় সীমিত বলে আমরা মনে করি যে, উক্ত ২০০৯ সালের আইনটি বিবেচনা করে এই ধারাটি পুনর্বিবেচনা করা যথাযথ হবে।

ধারা ২৫

আমরা ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকবার উল্লেখ করে বলেছি যে, উপদেষ্টা পরিষদে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে এমন অনেক কিছু যুক্ত করা হয়েছে, যা এ অধ্যাদেশের সর্বশেষ খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এর মধ্যে ধারা ২৫ এ অন্তর্ভুক্ত সাইবার বুলিং অন্যতম। এ বিধানটি ইতিমধ্যেই জনমনে নানান ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এই ধারাটি বলছে যে,

> "(১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো ব্যক্তিকে অপমান, হয়রানি, ব্ল্যাকমেইল বা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট কোনো তথ্য, অশ্লীল ভিডিও চিত্র, অডিও ভিজুয়াল চিত্র, গ্রাফিক্স বা অন্য কোনো উপায়ে ধারণকৃত, এডিটকৃত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত অথবা এডিটকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এবং যাহার কোনো শৈল্পিক বা শিক্ষাগত মূল্য নেই, এইরূপ কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করার হুমকি প্রদান করেন, যাহা আক্রমণাত্মক, ভীতি প্রদর্শক বা ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা হানিকর; তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।"

এ ছাড়া, এই ধারাতে দুটি ব্যাখ্যা যোগ করে সাইবার বুলিং ও ব্ল্যাকমেইলিং এর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

> **"ব্যাখ্যা।** - (ক) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে, "সাইবার বুলিং" বলিতে সোশ্যাল মিডিয়া, মেসেজিং প্লাটফর্ম, ওয়েবসাইট বা সাইবার স্পেসে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, হুমকি প্রদান, বা হয়রানি করা, মিথ্যা বা ক্ষতিকর তথ্য, অপমানজনক বার্তা, গালিগালাজ, গুজব বা মানহানিকর কন্টেন্ট ছড়ানোর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির সুনাম বা মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত (ট্রমা) করা বুঝবে।"

আমরা বলতে চাই, সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত আমাদের যে সংবিধান, তার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল এবং সে কারণে আমরা মনে করি এই ধারাতে এমন কিছু বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে যেগুলো অনুসরণ করা হলে বাংলাদেশের জনগন সাইবার জগতে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন না। কোনো ধরনের যৌক্তিক সমালোচনা করা হলেও তাকে ''অপমান'' বা ''হয়রানি'', বা ''ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা হানিকর'' বা ''ব্যক্তির সুনাম বা মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত'' করার বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে।

এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ বা কোনো কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করতে বা কোনো বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান করতে একজন সাধারণ মানুষ বা সাংবাদিক আগ্রহী হবে না। কেননা, শুধুমাত্র "শৈল্পিক এবং শিক্ষাগত মূল্য থাকার বিষয়টি" এ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এভাবে সমালোচনা করা বা মতামত প্রদান করার কাজগুলো করা হলে, যাকে উদ্দেশ্য করে তা করা হবে, তিনি উক্ত বিষয়গুলোকে "অপমানজনক", "হয়রানিমূলক", "সামাজিক মর্যাদা হানিকর", বা "সুনাম নষ্টকারী" হিসেবে বিবেচনা করে এই অধ্যাদেশের আশ্রয় নিয়ে সমালোচনাকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে বা মামলা করার উদ্যোগ নিতে পারবেন।

আমরা ইতিমধ্যেই এই অধ্যাদেশের ধারা ৮ এর পর্যালোচনায় বিস্তারিতভাবে বলেছি যে, কীভাবে বাংলাদেশ সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোতে বর্ণিত মানদণ্ড ও শর্তাবলী অনুসরণ করে অনলাইনে বা সাইবার জগতে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিশ্চিত করা যায়।

আমরা আরও বলেছি যে, আমরা মনে করি এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো বিস্তারিত গবেষণা করার পর অংশীজনের সাথে পরামর্শ করে একটি ভিন্ন আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু তা যদি এখন করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিধানটি বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল বিশেষ করে জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণা, ১৯৪৮ এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ, ১৯৬৬- এর ১৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মানদণ্ড এবং ইউরোপের মানবাধিকার আদালতের রায়সমূহে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে অতি সত্ত্বর সংশোধন করা প্রয়োজন। অন্যথায় গণতন্ত্রের যে সৌন্দর্য, জনগণের গঠনমূলক সমালোচনা করার যে অধিকার বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তা ব্যাহত হবে এবং যে-কোনো সরকার শুধুমাত্র এই একটি বিধান ব্যবহার করে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে, জনগণের কণ্ঠ স্থায়ীভাবে স্তব্দ করে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারবে। যদিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, চূড়ান্ত বিচারে কোনো সরকারই এ কাজে সফল হবে না, কিন্তু তারপরও জনসমর্থনহীন যে কোনো সরকার এ ধরনের একটি বিধানকে ব্যবহার করে, শুধু শুধু বিতর্ক উস্কে দিবে এবং পরবর্তীতে জাতির জীবনে কিছু মূল্যবান প্রাণ ও সম্পদের হানী ঘটবে।

আমরা যেহেতু মনে করি যে, এই বিধানটির আমুল পরিবর্তন বা সংস্কার দরকার, সে কারণে এ বিধানের পরিবর্তে আমাদের ভাষ্য অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকছি।

ধারা ২৬

অধ্যাদেশের ধারা ২৬ এ সাইবার স্পেসে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুভূতিতে আঘাত বা এইরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং তার জন্য দন্ডের বিধান করা হয়েছে। “ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং অনুভূতি” এই ব্যাপারগুলো খুবই আপেক্ষিক এবং সে কারণে এ বিষয়গুলোর অপব্যবহার করে এই বিধানটির অপপ্রয়োগ হওয়ার সুযোগ রয়েছে আমরা মনে করি। যদিও, আলোচ্য অধ্যাদেশে নতুন করে ধারা ৩১ (৩) ও (৪) যুক্ত করে কিছু সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরও আমরা মনে করি এই বিধানটি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। পাশাপাশি “ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং অনুভূতি” বলতে কি বুঝায় তাও স্পষ্টতর করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।

আপাতত, বাংলাদেশের দন্ডবিধি, ১৮৬০ সালের বিধান অনুসরণ করে আমরা আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ২৬(১)-এ কিছু শব্দ যুক্ত করার প্রস্তাব নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করছি-

> ২৬। (১) যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে বা সাইবার স্পেসে ছদ্ম পরিচয়ে নিজের বা অন্যের আইডিতে অবৈধ প্রবেশ করিয়া **সমাজের কোনো শ্রেণীর মানুষের** ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করিবার বা উস্কানি প্রদানের অভিপ্রায়ে সাইবার জগতে এরূপ কোনো **তথ্য, চিত্র, ভিডিও, গ্রাফিকস, ইত্যাদি** প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করান **যাহা উক্ত শ্রেণীর মানুষের** ধর্মীয় অনুভূতি বা ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরোধ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

পাশাপাশি, আমরা এটাও মনে করি যে, "ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং অনুভূতি" এই বিষয়গুলোর সাথে সাথে অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের আলোকে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার' মতো বিষয়গুলোকে ও এখানে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

ধারা ২৮

আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ২৮ এর ভাষ্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য এর ভাষ্য সামান্য সংশোধন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, ". . . আইনানুগ কারণ না জানিয়াও. . ." শব্দগুলোর পরিবর্তে ". . . আইনানুগ কারণ না**ই** জানিয়াও. . ." শব্দগুলো এবং "হইবে" শব্দটির পরিবর্তে "হইবে" শব্দটি ব্যবহার করতে হবে।

ধারা ৩০

আলোচ্য অধ্যাদেশে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত এ ধারার বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

ধারা ৩১

আলোচ্য অধ্যাদেশের ধারা ৩১ এ কিছু বিধান নতুন করে যোগ করা হয়েছে যা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে আমরা মনে করি এর সাথে ধারা ৮ এবং ২৫ এর বিষয়গুলো ও সংবেদনশীলতা বিবেচনায় এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে।

ধারা ৩৩ এবং ৩৪

ধারা ৩৩(১)(খ)-তে বর্ণিত "তথ্য প্রবাহের (traffic data)" শব্দগুলোর পরিবর্তে "ট্রাফিক ডেটা" শব্দগুলো ব্যবহার করা যথাযথ বলে মনে হয়, কেননা এই আইনের বিভিন্ন স্থানে "ট্রাফিক ডেটা" শব্দগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের বিধান বিবেচনা করে "ট্রাফিক ডেটা"-র সাথে সাথে "কনটেন্ট ডেটা এবং গ্রাহকের তথ্য-উপাত্তসমূহ" শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে আমরা মনে করি। আমাদের এই প্রস্তাব বিবেচনা করা হলে এই বিধানটিকে নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে-

> "(খ) কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে **ট্রাফিক ডেটা, কন্টেন্ট ডেটা এবং গ্রাহকের তথ্য-উপাত্তসমূহ** সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ; এবং"

এ ছাড়া, আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে, এই অধ্যাদেশের ধারা ২-তে "**কন্টেন্ট ডেটা**" শব্দগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হবে।

"তথ্য প্রবাহের (traffic data)" শব্দগুলো ধারা ৩৪ (অ)-তে ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় এ শব্দগুলো নিয়েও আমাদের একই রকমের প্রস্তাব থাকবে।

ধারা ৩৫

ডেটাযদিও কিছু সুরক্ষা এই ধারা ৩৫-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং যার জন্য আমরা এই অধ্যাদেশ প্রণেতাদের ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু তারপরও ধারা ৩৫-এ কোনো পুলিশ অফিসারকে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বা হচ্ছে বা হবার সম্ভাবনা রয়েছে বা সাক্ষ্য প্রমাণাদি হারানো, নষ্ট হওয়া, মুছে ফেলা, পরিবর্তন

বা অন্য কোনো উপায় দুষ্প্রাপ্য হইবার বা করিবার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন বিশ্বাস করার কারণ থাকলে উক্ত বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করে কোনো স্থানে তল্লাশি এবং অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্য জব্দ করা, কোনো ব্যক্তির দেহতল্লাশি করা এবং গ্রেফতার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং যদিও নতুন করে ধারা ৩৫(৩)-এ কোনো গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করার বিধান করা হয়েছে, কিন্তু তারপরও আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে এই বিধানটির অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলেই আমরা মনে করি। আমরা দেখেছি এ ধরনের বিধান আইনে থাকার পরেও শুধু পুলিশ অফিসার নয়, এমনকি সরকারী দলের কর্মীরাও মানুষের মোবাইল ফোন তল্লাশি করে জনগনের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে। সেজন্য বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল বিশেষ করে জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণা, ১৯৪৮ এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ, ১৯৬৬- এ বর্ণিত মানদণ্ড এবং ইউরোপের মানবাধিকার আদালতের রায়সমূহে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে এই বিধানটি পুনর্বিবেচনা করার প্রস্তাব আমরা রাখছি।

ধারা ৪৬

এই ধারার অধীনে ধারা ১৯-কে আমলযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য করা হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি ধারা ১৯ (১) এর দফা (ঙ) ও (চ) পুনর্বিবেচনা করা উচিত। আমরা আগেই বলেছি যে, এই বিধানগুলোতে অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারীর জন্য বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু এগুলো সাধারণত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা সাইবার জগতের ভৌত-অবকাঠামোর ক্ষতি সাধন করে না বলে, এগুলোকে ভিন্ন অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে এগুলোও অ-আমলযোগ্য এবং জামিনযোগ্য করা যুক্তিযুক্ত।

ধারা ৪৭

তাত্ত্বিকভাবে সাইবার জগত বলতে আমরা সাধারণত একটি কাল্পনিক জগতকে বুঝে থাকি, সে কারণে এই ধারাতে ব্যবহৃত ‘‘সাইবার উপকরণ’’ বলতে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে, তা না বলে শুধুমাত্র ‘‘উপকরণ’’ বলা যেতে পারে এবং তা বলা হলে এই ধারার মূল বক্তব্যে কোনো হের-ফের হয় না।

****